স্বামী বিবেকানন্দ ঃ কিছু জানা-অজানা তথ্যের পুনরালোচনা

অর্ণব বসু
এ. ডি. এস. আর., আলিপুর

(তৃতীয় পর্ব)

আমেরিকায় নিজের কর্মপদ্ধতি নিয়ে স্বামিজী নিজে খুব সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। তিনি অনুভব করছিলেন তাঁকে ঘিরে যে উন্মাদনা, তাতে যেন খুব একটা সারবত্তা নেই। ১৮৯৪ সালের পুরোটা জুড়েই দেখতে পাচ্ছি তিনি প্রায়ই পরিকল্পনা করছেন দেশে ফিরে আসার। সেপ্টেম্বর মাসেও (একটু বিরক্তই যেন) তিনি দেওয়ান বিহারীদাস হরিদাস দেশাইকে তিনি লিখেছেন, "জানি না কবে ভারতে ফিরতে পারব। মনে হচ্ছে দেশটার যথেষ্ট দেখে ফেলেছি। বোধহয়, খুব শিগগিরই এখান থেকে ইউরোপ যাব, আর তারপর সেখান থেকে ভারতে।"

যদিও এ সময়ই তিনি অনুভব করছিলেন বিশ্বধর্মসভার পর থেকে এ সময় পর্যন্ত আমেরিকা জুড়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে (তাঁর নামকরণ হয়ে গিয়েছিল 'সাইক্লোনিক হিন্দু') তাঁর প্রচার গোটা আমেরিকাতেই একটা লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলছিল। পাশ্চাত্যের হাজার বছরের পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গিতে এসে পড়ছিল নতুন ধরনের প্রাচ্য মানসিকতার আলো। স্বামিজী অনুভব করছিলেন প্রাচ্যের 'সনাতনধর্ম'কে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির মাপকাঠিতে নতুন করে অনুভব করতে হবে। এদিকে পাশ্চাত্যেও তখন জাগতিক ঐশ্বর্যের ছোঁয়ার ভোগবাদের বিপুল জোয়ার আসতে শুরু করেছে। এই নতুন যুগের উপযোগী করে স্বামিজী প্রাচ্যের সনাতন সত্যকে এমনভাবে পাশ্চাত্যে উপস্থাপিত করতে চাইলেন যাতে করে পাশ্চাত্যের সাধারণ মানুষও তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারেন।

কাজটি দুরূহ নিঃসন্দেহে; কিন্তু, স্বামিজীর মতো বিশ্বজনীন আচার্যের জন্য তো উপযুক্ত বটে। তিনি এও অনুভব করছিলেন যে তাঁর সাথে আমেরিকাবাসীর একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ১৮৯৪ এর অক্টোবর মাসে তিনি লিখছেন, "এতোদিনে আমি এদের ধর্মাচার্যদের মধ্যে একজন হয়ে দাঁড়িয়েছি। এঁরা সকলে আমাকে ও আমার উপদেশ পছন্দ করেন।" (পত্র সং ১২৯; বিহিমিয়া চাঁদকে লেখা)। এভাবেই তাঁর অদৃষ্ট আবার তাঁর জন্য কর্তব্য স্থির করে দিচ্ছিল—১৮৯৪ এর শেষ দিকে স্বামিজী দেখলেন তাঁকে আরো কিছুদিন থেকে যেতেই হচ্ছে।

....এর পরেই শুরু হবে পাশ্চাত্যে তাঁর সত্যিকারের মিশন।

১৮৯৪ সালের বর্ষশেষের আগের দিন 'ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' আয়োজিত ব্রুকলিনের 'পাউচ ম্যানসন' সভাঘরে আমেরিকা শুনল এক বিদ্যুৎবাহী ঘোষণা—''I have a message to the West as Buddha had a message to the east."—'প্রাচ্যকে যেমন বুদ্ধ শুনিয়েছিলেন সত্যের বাণী—তেমনই এক বাণী পাশ্চাত্যকে শোনাব আমি'। দেখছি, এরই কদিন পরে মাদ্রাজের এক বন্ধুকে তিনি লিখছেন, " I find I have a mission in this country also... I do not know when I shall go over to India. I obey the leading of the Lord. I am in his hands. 'In this world of wealth, thou art O Lord, the greatest Jewel I have found. I sacrifice myself unto thee.'

'In search of some one to love, thou art the One Beloved I have found. I sacrifice myself unto thee. ' (Yajur Veda Somhita)" (Letless of Swami Vivekanand); No. 74; To S. S. Aiyar dt 3rd Jan, 1895)।

" দেখছি এ দেশেও আমার একটি মিশন আছে। জানি না কবে দেশে ফিরতে পারব। আমি তাঁরই নির্দেশে চলেছি। তিনিই আমাকে চালাচ্ছেন।

'এ জগতে সম্পদের সন্ধান করতে গিয়ে, হে প্রভু, তোমাকেই সবচেয়ে অমূল্য রত্ন হিসেবে পেলাম। তোমাতেই আমি নিজেকে উৎসর্গ করলাম।'

এ জগতে ভালবাসার পাত্র হিসেবে সন্ধান করতে গিয়ে তোমাকেই পেলাম প্রভু। তোমাতেই আমি নিজেকে উৎসর্গ করলাম।' (যজুর্বেদ সংহিতা)" (পত্রাবলী ১৬১)।

(২)

ব্রুকলিনের সভার সাফল্যের পরে 'এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' স্বামিজীর আরো কয়েকটি বক্তৃতার আয়োজন করে। যথারীতি সেগুলিও খুবই সাফল্য অর্জন করে। এ সময় স্বামিজীর অনুরাগীদের অনেকেই, যেমন মিস এমা থার্সাবি[১], মিস আনা কর্বিন[২], মিসেস সি. আওয়েল[৩] প্রমুখ, নিজেদের বাড়িতে ছোট ছোট সভার (পার্লার বক্তৃতা) আয়োজন করেন। এগুলিতে স্বামিজী বক্তৃতা দেওয়ার পাশাপাশি সভায় আসা আগ্রহীদের নানা প্রশ্নের খুব সহজভাবে মুখোমুখি হতেন। এগুলিতেও প্রচুর লোক আকৃষ্ট হতে থাকেন।

১৮৯৫ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামিজী নিউইয়র্কের এক অতি সাধারণ অঞ্চলে (৫৪west ৩৩নং স্ট্রীট) একটি বাড়িভাড়া করে থাকতে শুরু করেন। এখান থেকেই শুরু হল তাঁর সত্যিকারের মিশন। 'নিউডিভারিস' এর লেখিকা মেরি লুইস বার্কের ভাষায় যা-ছিল, 'নিবিড়ভাবে শিক্ষাদান আর আধুনিক পাশ্চাত্যের জন্য তার উপযোগী করে সংহত, বিস্তারিত একটি ধর্ম ও দর্শনকে তুলে ধরা যা পাশ্চাত্যের মাধ্যমে পুরো জগতে ছড়িয়ে পড়বে।'

কিন্তু প্রথমেই একটি সমস্যা দেখা দিল—এই ৫৪ ওয়েস্ট ৩৩নং স্ট্রীটের বাসস্থানটি তখনকার মাপকাঠিতে ঠিক ভদ্রজনোচিত ছিল না। স্বামিজী নিজে সন্তুষ্ট হলেও তাঁর বন্ধুদের অনেকেই আশংকা করছিলেন এখানে তেমন 'ঠিকঠাক' লোকজন বোধ হয় আসবেন না। এর প্রায় মাস দুয়েক পরে লেখা একটি চিঠিতে স্বামিজী নিজেই বলেছেন," আমার বন্ধুরা সবাই ভেবেছিলেন। একলা একলা এরকম গরিব পাড়ায় এভাবে থাকলে ও প্রচার করলে কিছুই হবে না। আর কোন ভদ্রঘরের মহিলাই সেখানে আসবেন না। বিশেষ করে মিস হ্যামলিন তো ভেবেছিলেন 'তিনি বা তাঁর ঠিকঠাক লোকজনেরা' এরকম বাড়িতে থাকা কারো কাছে উপদেশ শুনতে আসবেন না। 'ঠিক-ঠাক' লোকেরা কিন্তু দিনেরাতে আসতেই থাকলেন, তিনি নিজেও আসলেন। সত্যিই ঈশ্বর, তোমার ও তোমার কৃপার ওপর আস্থা রাখা মানুষের পক্ষে কি কঠিন কাজই না বটে! কিন্তু 'ঠিক' লোকই বা কে—'বেঠিক' ই বা কে; মা? সবই তো 'তিনি'। ...পাপীতেও তিনি, পুন্যাত্মাতেও 'তিনি'। দেহে, মনে, প্রাণে আমি তাঁরই শরণাগত। [মিসেস ওলি বুলকে লেখা; ১৪ই মার্চ, ১৮৯৪]

জানুয়ারীর ২৮ তারিখ স্বামিজী এই বাড়িটিতে তাঁর ক্লাস শুরু করেন। প্রথম দিনে অন্ততঃ তাঁর বন্ধুদের আশংকাই সত্য বলে প্রমাণিত হল। সামান্য কয়েকজনই মাত্র এদিন উপস্থিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন সারা এলেন ওয়াল্ডো। বছর পঞ্চাশের এই অবিবাহিতা মহিলা ছিলেন ব্রুকলিনের বাসিন্দা এবং 'ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্যা। তিনি স্বামিজীকে সেখানেই প্রথম দেখেন ও তাঁর বক্তৃতা শোনেন। ইনি পরে স্বামিজীর আমেরিকার ঘনিষ্ঠতম শিষ্যদের মধ্যে একজন হয়ে উঠবেন। তাঁরই বিবরণী[৪] থেকে পাচ্ছি।

"স্বামিজী তখন খুব সাধারণভাবে নিউইয়র্কে থাকতেন, তাঁর প্রথম দিককার ক্লাশগুলি তিনি সে ছোট বাড়িটিতে থাকতেন সেখানেই আরম্ভ হয়েছিল। শুরুর দিকে তখন মাত্র তিনচারজনই আসতেন।"

কিন্তু, এ তো কেবল শুরু। খুব তাড়াতাড়িই খবর ছড়িয়ে পড়ল এবং ব্রুকলিন সভায় ও পার্লার বক্তৃতাগুলিতে যাঁরা স্বামিজীর মুখোমুখি হয়েছিলেন তাঁরা স্বামিজীকে খুঁজে বের করে নিলেন। সব অর্থেই 'ঠিকঠাক' লোকেরা এবার স্বামিজীর সেই ছোট্ট বাড়িটিতেই ভিড় করতে শুরু করলেন। মিস ওয়াল্ডোই বলেছেন, "বিদ্যুৎ গতিতে ক্লাশের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এরপর সেই ছোট্ট ঘরটিতেই লোক উপচে পড়তে থাকল। স্বামিজী নিজে মাটিতেই বসতেন। স্রোতাদের

অধিকাংশও তাই। তারপর আস্তে আস্তে মার্বেলের ড্রেসারটি, সোফার হাতলগুলি, ঘরের কোনায় রাখা ওয়াশস্ট্যান্ডগুলিও ক্রমশ বাড়তে থাকা স্রোতাদের বসবার জায়গা হয়ে উঠল। এরপর জায়গা করে দিতে ঘরের দরজা খুলে রাখা শুরু হল—শেষে সেই ভিড় বাইরের ঘর ছাপিয়ে সিঁড়ি অব্দি পৌঁছে গেল। অনেকেই সিঁড়িতেই বসে পড়তেন। "সে সময় যাঁরা এসেছিলেন—তাঁরা কেউই বোধ হয় সেই ক্লাশগুলির কথা ভুলতে পারবেন না। স্বামিজীর সেই গভীর, প্রাণছুঁয়ে যাওয়া অথচ সহজ বাণী সমস্ত ছোটখাট অসুবিধাগুলি উপেক্ষা করে সবাই যেন দমবন্ধ করে শুনতেন।"

'স্বামিজীর আরেক শিষ্যা জোসেফিন ম্যাকলাউডের ভাষায়, "১৮৯৫ এর ২৯শে জানুয়ারি আমি আমার বোনের সাথে নিউইয়র্কের ৫৪ ওয়েস্ট ৩৩নং স্ট্রীটের বাড়িতে যাই। সেখানে তখন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বসবার ঘরে ক্লাশের আয়োজন করছিলেন। দেখলাম সেখানে জনা পনেরো-কুড়ি মহিলা ও দু-তিনজন পুরুষ ছিলেন। ছোট্ট ঘরটা তাতেই উপচে পড়ছিল। ঘরের সব কটা চেয়ারই ভরে গেছিল, আমি একেবারে সামনের সারিতে মেঝেতে বসেছিলাম। স্বামিজী ছিলেন একটা কোনায় দাঁড়িয়ে। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি ঠিক কী বলেছিলেন, আমার এখন আর তা মনে নেই—তবে এটা মনে আছে আমি তক্ষুনি উপলব্ধি করলাম তিনি যা বললেন তা পুরোপুরি 'সত্য'। তিনি যে দ্বিতীয় বাক্যটি বললেন তাও 'সত্য'। তৃতীয় বাক্যটিও তাই। তারপরের সাত বছর ধরে ওঁকে আমি শুনেছি এবং তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই আমার কাছে 'সত্য'। (স্বামিজীকে) সেই (প্রথম শোনার) মুহূর্ত থেকে আমার কাছে জীবনের অর্থ-ই বদলে গেল।...স্বামিজী যেভাবে কারো হৃদয় সাহসে পরিপূর্ণ করে দিতেন তা-ই বোধহয় ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি।.. তিনি আমাদের সবসময় বললেন, 'মনে রেখ, তুমি কেবল ঘটনাচক্রে একজন আমেরিকান, কেবলই ঘটনাচক্রে একজন নারী। কিন্তু, সবসময়ই তুমি ঈশ্বরের সন্তান। দিন-রাত নিজেকে এটিই বলবে'।"

এ সময়কার একটি ক্লাশের অভিজ্ঞতা নিয়ে জনৈকা নিউইয়র্ক বাসিনী এলা হুইলার উইলকক্স পরে (১৯০৭ সালে) স্মৃতিচারণা করেছেন,—" বার বছর আগে এক সন্ধ্যেতে আমি শুনতে পেলাম স্বামী বিবেকানন্দ নামে এক ভারতীয় আচার্য আমার বাড়ির কাছেই বক্তৃতা করবেন। কিছুটা কৌতূহল নিয়েই আমরা (সেদিন) বক্তৃতাস্থলে গেলাম।...(স্বামিজীর) বক্তৃতা শুরুর মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা যেন এক অপূর্ব সুন্দর জগতে পৌঁছে গেলাম। তারপর বাক্‌রুদ্ধ হয়ে দমবন্ধ করে বক্তৃতার শেষ অব্দি শুনলাম।"

(বক্তৃতা শেষে) যখন আমরা বেরিয়ে আসছি তখন আমাদের হৃদয় এক নতুন সাহস, নতুন আশা, নতুন বিশ্বাসে পূর্ণ; জীবনের দৈনন্দিন ওঠাপড়ার মুখোমুখি হতে আমরা তখন পুরোপুরি তৈরি। আমার স্বামী বলতে লাগলেন, 'আরে আমি তো এমনই এক ধর্ম—দর্শনের খোঁজে ছিলাম! ঈশ্বরকেও তো আমি এভাবেই দেখতে চাই!'

...সে সময়টা ছিল এক দুঃস্বপ্নের মত। সে বারের প্রচণ্ড শীতে (দেশের) অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। ব্যাঙ্কগুলো ফেল করছিল, ফেটে যাওয়া বেলুনের মত স্টকগুল পড়ে যাচ্ছিল, ব্যবসায়ীমহলে নেমে এসেছিল হতাশার কালো ছায়া। সবটাই যেন কেমন এক উথাল পাথাল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল।... বেশ কিছু দিনের আশংকা ও উদ্বেগের বিচিত্র রাত্রি কাটানোর পরই সেবার আমার স্বামী আমার সাথে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন। বক্তৃতাশেষে যখন সেই বিষন্ন শীতরাত্রির রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরছি তখন দেখলাম আমার স্বামী মৃদু মৃদু হাসছেন, তিনি বললেন, 'ঠিক আছে চল। অত চিন্তার কোন কারণ নেই।' আমিও অনেক বেশি সময় নিয়ে আমরা দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ফিরে গেলাম।"

স্বামিজী তো এরকম জেগে ওঠারই আহ্বান করতেন। তিনি চাইতেন তাঁর শিষ্য-শিষ্যারা অদ্বৈত জ্ঞানের আলোয় নিজের প্রাণে উপলব্ধি করুন আত্মার মহত্ত্ব। শ্রীমতী বার্কের ভাষায়, "তাঁর আশু উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের (শ্রোতাদের) প্রাণে অদ্বৈত জ্ঞানের মহৎ সত্যকে উপলব্ধি করানো, যাতে তাঁরা সবরকম ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্মীয় সংকীর্ণতার বেড়া ভেঙে ফেলে আধ্যাত্মিক দিক থেকে সবধরনের পর নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। উঠে দাঁড়াতে পারেন নিজের পায়ে, হয়ে উঠতে পারেন নির্ভীক, আকাঙ্খাহীন, ভাগ্যের মারের হাত থেকে উদাসীন।" (পৃঃ ১৪, নিউ ডিসকভারিস, ৩য় খণ্ড)।

এই 'শিক্ষা', এই মিশন সম্বন্ধে অনেক আগেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর কদিন আগে তিনি একটা কাগজে লিখেছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দেবে।' আর তা দেখে তাঁর 'নরেন' যখন আঁতকে উঠে বলেছিলেন,'ওসব আমি পারবটারব না।' তখন তিনি বলেছিলেন, 'তোর হাড় পারবে।'

(৩)

নিউইয়র্কের এই ৫৪ ওয়েস্ট ৩৩নং স্ট্রীটের বাড়িটিতে স্বামিজী এপ্রিল মাসের কয়েকটি দিন বাদে জানুয়ারির শেষ দিক থেকে জুন মাসের ৩ তারিখ অব্দি ছিলেন। এ সময়ে তাঁর শিক্ষাদান ছিল প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের আদর্শে যখন ছাত্রদের ভরণপোষণের দায়িত্বও থাকত গুরুরই ওপর। স্বামিজী ও তাঁর বাড়িতে আয়োজিত ক্লাশের জন্য তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে কোনো ফিস্ নিতেন না। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন ধনী সম্প্রদায়ের, তবে বেশিরভাগই ছিলেন গরিব। তাঁরা নিজেরাই চাঁদা তুলে নিজেদের মতো করে প্রচারের জন্য, ক্লাশের সংগঠনের কাজে সহায়তা করতেন। স্বামিজী নিজে এর বাইরে নিউইয়র্কে বেশ কিছু সাধারণ বক্তৃতা (Public lecture) দেন যা থেকে উপার্জিত অর্থে তিনি এই ক্লাশ চালানোর চেষ্টা করতেন। 'নিউ ডিসকভারিস' এর তথ্যপঞ্জী থেকে পাচ্ছি জানুয়ারির ২০, ফেব্রুয়ারির ৩, ১৭; এপ্রিলের ৭-(সবগুলি রবিবার), ফেব্রুয়ারির ২৫ (সোমবার) তারিখে স্বামিজী সাধারণের জন্য বক্তৃতা দেন। স্বামিজীর এক শিষ্যা লরা প্লেন (ইনি পরে স্বামিজীর কাছে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নেবেন ও 'সিস্টার দেবমাতা' হিসেবে পরিচিত হবেন এবং সন্ন্যাসিনী হিসেবে পরে অনেকদিন ইনি কলকাতায় এসে কাজ করবেন।) এর স্মৃতিকথা থেকে 'বেদান্ত' ও 'যোগ' এর ওপর স্বামিজীর এরকম দুটি বক্তৃতার ও তাতে শ্রোতাদের আপ্লুত হয়ে যাওয়ার কথা জানতে পারছি। ইনি লিখেছেন, "এ সময় একদিন ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ ধরে হেঁটে যেতে যেতে 'হল অফ ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড' এর জানলায় একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম—"আগামি রবিবার বেলা ৩টেয়, স্বামী বিবেকানন্দ 'বেদান্ত' বিষয়ে বক্তৃতা করবেন। আর তার পরের রবিবারের বিষয় 'যোগ'। আমি (ঐ রবিবার) বক্তৃতা শুরুর কুড়ি মিনিট আগেই পৌঁছে গেলাম। হল তখনই অর্ধেক ভরে গেছে। হলটা ছিল খানিকটা লম্বাটে মতন; এবং খুব বড় ছিল না...তাতে একটাই দরজা সিঁড়ি ছিল এবং বক্তা, শ্রোতা সবাই-কেই ওটিই ব্যবহার করতে হবে। সেখান থেকে একটি রাস্তা এগিয়ে এসে দু-ধারের দর্শকাসনের মাঝখান দিয়ে সোজা প্লাটফর্মের দিকে চলে গেছে।....তিনটে নাগাদ দেখলাম জল, সিঁড়ি, জানলার নিচের তাকগুলি, রেলিংগুলি সব ভর্তি হয়ে গেছে; এমন কি অনেকে নিচেও দাঁড়িয়ে ছিলেন—যদি বা ওপারের হলের বক্তৃতার কোনো অংশের প্রতিধ্বনিও কানে আসে এই আশায়।

হঠাৎ-ই একটু চাপা সোরগোল শোনা গেল —দেখলাম, সিঁড়ির ওপর দিয়ে দৃপ্ত অথচ মুগ্ধ পদচারণায় এসে স্বামিজী আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ালেন।...তিনি বলতে শুরু করলেন। সাথে সাথে আমার অতীত, বর্তমান, আমার চারপাশের লোকজন, আমার স্মৃতি, সব কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু এক অদ্ভুত শূন্যতার মধ্যে দিয়ে তাঁর অপূর্ব কণ্ঠই বেজে চলেছে...। আমার সামনে যেন একটা দরজা খুলে গেল আর আমি যেন তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসে এক রাস্তায় এসে পড়লাম। সেই রাস্তা চলেছে এক অনন্ত আনন্দের অভিমুখে।

...অনেক পরে যখন সম্বিৎ ফিরে পেলাম তখন পুরো হল 'ফাঁকা হয়ে গিয়েছে—কেবল স্বামিজী ও দু-জন মাত্র প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে তখন। পরে জেনেছিলাম তাঁরা হলেন স্বামিজীর দুই একনিষ্ঠ ভক্ত—মিঃ ও মিসেস গুড্ইয়ার। মিঃ গুডইয়ারই ঐ সভায় ঘোষণা করেছিলেন।"

—নিজের এরকম 'বিমূর্ত স্বর' হয়ে ওঠার কথাই তো স্বামিজী বলেছিলেন। দেখছি ১৮৯৪ এর শুরুর দিকেই গুরুভাই 'শশী' (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) কে তিনি লিখেছিলেন, "I am a voice without a form."

(৪)

কিন্তু, এই 'সাধারণ বক্তৃতা' গুলি আর্থিক দিক থেকে খুব বেশি লাভজনক ছিল না। দেখছি, নিউইয়র্কের ক্লাশ শুরুর হপ্তা তিনেক পরে শ্রীমতী হেলকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, "আমার কাজ ভালই চলছে। তবে টাকাপয়সার দিকটা-ঐ কোনমতে চালিয়ে নিচ্ছি। কারণ, আমার ঘরে যে ক্লাশ আমি নিই তার জন্য কোনো পয়সা আমি কারো কাছ থেকে নিই না। আর সাধারণ বক্তৃতাগুলি থেকে যে টাকা পয়সা পাওয়া যায় তা থেকে খরচটরচ বাদ দিয়ে বিশেষ কিছু থাকে না—বিশেষ করে হলভাড়ার জন্য অনেকটা টাকা চলে যায়।"

কিন্তু, স্বামিজী নিজে বেশ খুশিই ছিলেন। নিউইয়র্কে তাঁর এই মিশনের জন্য তাঁকে খুব বেশি অন্যের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছিল না। ক্লাশের সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বেশিটারই সংস্থান তিনি নিজেই কোনমতে করে ফেলছিলেন। দেখছি, ক্লাশ শুরুর তিন সপ্তাহ পরে ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫ তারিখে শ্রীমতী বুলকে তিনি লিখেছেন, "আমি এখন খুব আনন্দে আছি। আমি আর মিঃ ল্যান্ডসবার্গ[৫] মিলে চাল-ডাল-যব যা হোক কিছু রেঁধে খেয়ে নিই।"

"এই চিঠিতেই তিনি শ্রীমতী বুলের সাহায্য বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করছেন, বলছেন, " 'মনুর'র মতে, ভাল কাজের জন্য হলেও সন্ন্যাসীর অর্থ সংগ্রহ করা ঠিক নয়।"

'...(এ জগতে) সম্পদে দারিদ্রের ভয়, জ্ঞানে ভয় মূঢ়তার, রূপে জরার ভয়, খ্যাতিতে ভয়, নিন্দুকের ভয়, সাফল্যে ঈর্ষার ভয়, এমন কি দেহে ও মৃত্যুর ভয়। এ সংসারে সবই আতঙ্কে পরিপূর্ণ। তাই এখানে যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন তিনিই কেবল নির্ভয়।' (ভর্তৃহরি ঃ বৈরাগ্য শতকম)

" মনে হচ্ছে এখন যতখানি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করছি আমেরিকায় আগে কখনো তেমনটা হয় নি?"

(৫)

এ সময়ে স্বামিজীর শরীর কিন্তু ভাল থাকছিল না। ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে দেখছি তিনি লিখেছেন, "এ বছরের এক নাগাড়ে কাজের ফলে শরীর বেশ ভেঙে গেছে। স্নায়ু বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই শীতে একটা রাতও ভাল করে ঘুমোতে পারি নি। আমি জানি আমি খুব পরিশ্রম করছি.....।"

ডিসেম্বর থেকে একটানা কাজ করে যাবার পর স্বামিজী একটু বিশ্রামের সুযোগ পেলেন এপ্রিল মাসে। ১১ই এপ্রিল তিনি তাঁর অনুরাগী ফ্রান্সিস লেগেটের গ্রীষ্মাবাস হাডসন উপত্যকার 'রিজলি ম্যানর' এ যান। সেখান থেকে আবার নিউইয়র্কে ফেরেন ২৩শে এপ্রিল। ফিরে দেখেন ল্যান্ডসবার্গ চলে গেছেন। (মিঃ ল্যান্ডস্বার্গ শেষ দিকটা স্বামিজীকে ভুল বুঝতে শুরু করেন, পরে অবশ্য স্বামিজীর থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে থাকার সময় সেখানে ফিরে আসেন। সেখানে স্বামিজী তাঁকে সন্ন্যাস দেন ও নাম দেন 'কৃপানন্দ স্বামী।)

দেখছি স্বামিজী এ সময় লিখছেন, "খুব ভাল বেড়িয়ে এলাম। পাহাড় ও গ্রামাঞ্চলের দৃশ্য খুব ভাল ভাবে উপভোগ করলাম। বিশেষ করে মিঃ লেপেটের গ্রীষ্মাবাসটি খুব ভাল লাগল। এসে দেখছি বেচারা ল্যান্ডস্বার্গ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। সে তার কোন ঠিকানা রেখে যায় নি। যেখানেই সে যাক, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। আশা করি আমি নিজে একাই ঠিকভাবে কাজ করে যেতে পারব। মানুষের যত কম সাহায্য নেওয়া যায়, তত বেশি পাওয়া যায় ঈশ্বরের কাছ থেকে!"

কিন্তু, স্বামিজীর কাজের জন্য সহায়ক দরকার ছিলই। ঈশ্বরই যেন তাঁদের পাঠালেন। এ সময় মিম হ্যামলেন, সারা এলেন ওয়াল্ডো, রুথ এলিস প্রমুখ শিষ্যারা এগিয়ে এসে স্বামিজীর কাজে সাহায্য করেন। এভাবে মে মাসের শেষ অব্দি স্বামিজী নিউইয়র্কের আবাসে কাজ চালিয়ে যান, শ্রীমতি বার্কের ভাষায় যে কাজ ছিল—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনের সব ক্ষেত্রের জন্য উপযোগী করে তাঁর গুরুদেবের বাণীকে প্রচার করা। প্রাচ্য জীবনের বিষয়ে তিনি অবহিতই ছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্য জীবনের সম্বন্ধে ও তাঁর জানার ব্যাপারে কোনো ক্লান্তি ছিল না। সমসাময়িক তথ্যাবলী থেকে জানা যাচ্ছে ক্লাস নেওয়া, সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাথে দেখা করা, ধ্যান করা, চিঠিপত্র লেখালেখির মধ্যেই তিনি সময় বের করে পাশ্চাত্যের ইতিহাস, সংস্কৃতি নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতেন। আবার এই পুরো সময়টা জুড়েই দেখা যাচ্ছে এ সবেরই পাশাপাশি তিনি ভারতে ভবিষ্যত কাজের পদ্ধতি নিয়ে কলকাতায়, মাদ্রাজে গুরুভাইদের, অনুরাগীদের দীর্ঘ উদ্দীপনাময় চিঠি লিখেছেন—ভারতে তাঁর ভবিষ্যত মিশনের রূপরেখা ঠিক করে নিচ্ছেন।

এ ভাবেই স্বামিজীর পাশ্চাত্যে মূল মিশনের প্রথম দফার কাজ সাফল্যমন্ডিত হল। জুনের ১ তারিখ স্বামিজী নিউইয়র্কে এ বারের মত শেষ ক্লাশ নিলেন। উৎফুল্লচিত্ত স্বামিজীকে এ সময় লিখতে দেখা গেল।

"এ বারের শীতে নিউইয়র্কে খুব ভাল কাজ হয়েছে।"

"এতদিনে নিউইয়র্কে কাজের একটা ভিত স্থাপন করা গেছে এবং আশা করি এদেশে আমার অবর্তমানে এখানে

কাজ চালিয়ে যাওয়ার মত একটা স্থায়ী দল তৈরি হয়ে গেছে।....আর্থিক দিক থেকে (একাজ) সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তবে জগতের সমস্ত অর্থের চাইতেও 'মানুষ'ই তো বেশি মূল্যবান।"

(৬)

নিউইয়র্কে এসময় বেশ গরম পড়ে যাচ্ছিল। অধিবাসীদের প্রায় সবাই হয় শৈলবাস না হয় সমুদ্রসৈকত অভিমুখী হচ্ছিলেন। স্বামিজী নিজেও এই দীর্ঘ একটানা কাজের পর একটু বিশ্রাম চাইছিলেন।

কিন্তু, তাঁর শিষ্য-শিষ্যারা চাইছিলেন না নিউইয়র্কের ক্লাশ বেশি দিন বন্ধ থাকুক। এরকম পরিস্থিতিতে তাঁর এক শিষ্যা মিস্ ডাচারের প্রস্তাব যেন ঈশ্বরপ্রেরিত হয়ে এল। নিউইয়র্ক থেকে ৩০০ মাইল উত্তরে সেন্ট লরেন্স নদীর তীরবর্তী তীরবর্তী 'থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড' অঞ্চলে মি ডাচারের একটি ছোট কটেজ ছিল। তিনি সেখানে স্বামিজী ও উৎসাহী অন্য শিষ্য-শিষ্যাদের যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন।

স্বামীজী জুনের ৪ তারিখ নিউইয়র্ক ছাড়লেন। সেখান থেকে নিউহ্যাম্পশায়ার হোয়াইট মাউন্টেন অঞ্চলের ক্যাম্প শার্সিতে মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটের গ্রীষ্মাবাসে ৬ই জুন পৌঁছন এবং সেখানে ১২ দিন কাটান। এরপর এখান থেকে জুনের ১৮ তারিখে মঙ্গলবার সকালে ২০০ মাইল পূর্বে থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। সেখানে আগে থেকেই তাঁর শিষ্যরা পৌঁছে গিয়েছিলেন। একটি হাতে তৈরি 'Welcome Vivekananda' লেখা সাধারণ ব্যানার দিয়ে তাঁরা স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করে নিলেন।

১৯শে জুন থেকে ৬ই আগষ্ট-এই ছয় সপ্তাহ স্বামিজী এখানে থাকবেন। স্বামিজীর আমেরিকার মিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি এরপর এই মাঝের সময়টিতে এখানেই রচিত হবে।

ঋণস্বীকার ও তথ্যসূত্র

(১) স্বামী বিবেকানন্দ ইন দ্য ওয়েস্ট, নিউ ডিসকভারিস ঃ ওয়াল্ড টিচার; ভল্যুম ৩। অদ্বৈত প্রকাশন।

(২) লেটারস অফ স্বামী বিবেকানন্দ। অদ্বৈত প্রকাশন।

(৩) স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী। উদ্বোধন কার্যালয়।

(৪) ইনস্পায়ার্ড টক্স্। সারা এলেন ওয়াল্ডো রচিত। অদ্বৈত প্রকাশন।

এ লেখাটিতে প্রথম বইটি মূলতঃ ব্যবহৃত হয়েছে। অনবাদ মূলতঃ লেখকের।

টীকা ঃ

(১) এমা থার্সবি ঃ ইনি ছিলেন নিউইয়র্কের বিখ্যাত গায়িকা এবং ধনী ও অভিজাত সমাজের প্রতিনিধি। এঁর বাড়িতে স্বামিজী 'পার্লার বক্তৃতা করেন। এঁর বাড়ির 'বক্তৃতায় উপস্থিত থাকতেন সমকালীন অভিজাত নিউইয়র্ক সমাজের একেবারে বাছাই করা অংশ।

(২) আনা কর্বিন ঃ ইনি ছিলেন সে যুগের এক বিখ্যাত ধনী 'রেলরোড টাইকুন' অস্টিন কর্বিনের মেয়ে। থাকতে নিউইয়র্কের অভিজাত এলাকা 'ফিফ্থ অ্যাভিনিউ' এর একটি প্রাসাদে। এঁর বাড়ির বক্তৃতায় 'সমসাময়িক নিউইয়র্কের অভিজাত সমাজের নবীন প্রজন্ম স্বামিজীর মুখোমুখি হতেন।

(৩) সি. আন্তয়েল ঃ তাঁর বাড়িতে স্বামিজী বক্তৃতা করেন। বিশেষ আর তথ্য নেই।

(৪) সারা এলেন ওয়াল্ডোর বিবরণী ঃ সারা এলেন ওয়াল্ডোর বিখ্যাত বিবরণী—'ইনস্পায়ার্ড টক্স্' (বাংলার অনুদিত 'দেববাণী' নামে). নিউইয়র্কের ক্লাশ ও থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডের ক্লাশের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এটি।

(৫) ল্যান্ডসবার্গ ঃ লিঁয় ল্যান্ডাসবাগ। সাংবাদিক। স্বামিজীর প্রতি অনুরক্ত হন ও গুরু হিসেবে তাঁকে বরণ করে নেন। ২৮শে জানুয়ারী থেকে ৫৪ ওয়েস্ট ৩৩নং স্ট্রীটের বাড়িতে স্বামিজীর সাথে থাকতে শুরু করেন। মাঝে স্বামিজীকে ভুল বুঝে চলে যান, পরে অবশ্য থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কের শিবিরে যোগ দেন। সেখানে স্বামিজী তাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করেন।

৺বিশ্বনাথ দাস ঃ স্মৃতিতর্পণ

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি. সি. এস. আর.(লিগ্যাল), পঃ বঃ

"সে কেন তলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয় !....."

অন্তর্মুখী, অন্তর্লীন, প্রাণপ্রবাহে বহমান। মিতভাষী, অনুচ্চ কণ্ঠস্বর, স্পষ্টবক্তা, স্মিত কৌতুকে সরস, সাধাসিধে। সংসারী।

নাহ্। এ-ভাবে কি বিশ্বনাথ দাস-কে ঠিক বোঝানো যায়? বা অন্য কাউকেও?

বিশ্বনাথ বয়সে ও চাকুরিতে অল্প প্রবীণ আমার থেকে। চিনতাম আগে থেকেই। ঘনিষ্ঠ পরিচয় হোলো ওর কাছ থেকে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর এ. ডি. এস. আর. অফিসের চার্জ বুঝে নেওয়ার সময়। বিকেলে আমায় চার্জ দেয়ার পরে সন্ধ্যেয় আমায় নিয়ে বিষ্ণুপুরে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে এল। কিছু কাজ-কর্মের সুবিধে-অসুবিধে-সমস্যা-প্রকৃতি নিজের মতো ক'রে বুঝিয়ে দিল। ব্যবহারে-আলাপচারিতায় কোন জড়তা বা আড়াল নেই। জীবনে খুব একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়—আবার কেউ টেনে নামানোর চেষ্টা করলে যথেষ্ট প্রতিবাদী।

কয়েক বছর আগে মালদা থেকে মুর্শিদাবাদে যখন ডি. আর. হয়ে গেলাম, সেখানে ইতোমধ্যে ডি. আই. জি রেঞ্জ-৬ হিসেবে কর্মরত বিশ্বনাথ দাস। কবে মোটামুটি কী সময়ে আসব জানানো ছিল। পথেই ঘন ঘন ফোন পেলাম—রাস্তায় কখন কোথায় পৌঁছেছি বা আছি জানাতে হোলো। ডি. আর. -এর গাড়ি অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় নিজের গাড়ি পৌঁছে দিল বাসস্তপে যেখানে নেমে আমায় কর্মস্থলে আসতে হবে। আমি বহরমপুরে সপরিবারে থাকলেও ও ছিল একা একটি মেসে। এবং অবশ্যই উইকএন্ডার কলকাতায়।

জীবনযাপনে আমি ওকে লো-প্রফাইলেই চলতে দেখেছি। অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। খাওয়া-দাওয়াও সাধারণ গড়পড়তা বাঙালিরই মতো।—বিপুল বা হাই-ফাই আয়োজনে নয়। কিন্তু, তা'তে ছিল তৃপ্তির প্রকাশ। ওকে তিফিন খেতে দেখেছি মুড়ি, শশা, ছোলাভাজা ইত্যাদি। আর কয়েক রাউন্ড চা এবং অবশ্যই সিগারেট। ওকে অনেকবার বলেছি, "এত সিগারেট খাওয়া কমাও।" ওকে একটু বিব্রত দেখাত। বহরমপুরে আমরা পরস্পরের চেম্বারে গিয়ে রোজই দেখা-সাক্ষাৎ, গল্প এবং দরকার মতো সরকারী কাজ-কর্মের আলোচনা করতাম। ওকে আমার চেম্বারে চা-পানের পরে মৌজ করে সিগারেট ধরাতে দেখে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছি— বলেছি, "এতা সরকারি অফিস, নো স্মোকিং জোন।" প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও পরে ওর নিজস্ব হাসিতে ফেটে পড়ে ও তখন বলেছে, "তুমি ফাইন করবে আমার? করো! করো!" এরপরে সত্যি আর কিছু কি বলা যায়?

আবার আশ্চর্য যে আমি এবং ও প্রায় একই সময়ে বদলি হয়ে উঃ ২৪ পরগণার ডি. আর. ও ডি. আই. জি পদে যোগ দিলাম। অর্থাৎ সেই একই জুতি। ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের ও পরিচিতির পর্যায়ে আমাদের কোনদিন মতান্তর বা মনোমালিন্য হয় নি। এতা ওরই কৃতিত্ব। নিজে খুব সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও খুব এ্যাসোসিয়েশন-মনস্ক ছিল ও। প্রবীণদের সঙ্গে নবীনদেরও খুব ভালবাসত। ভরসাও করত।

ওর মতো একজন খাঁটি বন্ধুর অভাব আমি নিয়ত অনুভব করব। ওর উদ্দেশ্যে বলব, "দ্যাখো তো কাজ-কর্ম সব ঠিকঠাক করতে পারছি কি না।" বহরমপুরে কাশিমবাজার মন্দিরের কাছে মনোরম পরিবেশে আমাদের জেলাসদরের স্তাফ-অফিসারদের শীতকালীন চড়ুইভাতির কথা মনে পড়ে—সেখানে আমাদের একত্রিত কিছু ফোতো তোলা হয়েছিল। মাঝে-মধ্যে সেগুলো বার ক'রে দেখি ও বিষণ্ণ হয়ে যাই। বুঝি, স্মৃতি ও অতীত অনেক সময়েই নির্মম। তবু ভাবি ঃ "কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।"

স্বদেশ-চিন্তন

ইতিহাসের আলোকে দক্ষিণ দিনাজপুর

বিভূতি ভূষণ মণ্ডল

অতিরিক্ত জেলা অবর নিবন্ধক, (সদর) বালুরঘাত

"তেলের শিশি ভাঙ্গল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙ্গে ভাগ করো।
তার বেলা?"

বুড়ো খোকাদের অবিমৃষ্যকারিতায় আমাদের ভারত খণ্ডিত হয়েছে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট, অনেক ঐতিহাসিক অভিমত পোষণ করেন যে এই অঙ্গচ্ছেদ ছিল অপরিহার্য এবং মুসলিম লীগ এর জন্য দায়ী। আবার আসমা জাহাঙ্গীর, অনিতা ইন্দর সিং প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা তথ্য প্রমানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন যে মুসলিম লীগকে ভারত ভাগের জন্য কেবলমাত্র দায়ী করা যায় না। বস্তুতঃ ইংরেজরা অখণ্ড ভারতবর্ষ রেখেই চলে যেতে চেয়েছিলেন। তা হয়নি, স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে খণ্ডিত হয়েছে বাংলা, বাঙ্গালী এবং তার ইতিহাসচেতনা। এক অব্যক্ত যন্ত্রণা নিয়ে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ আজও খুঁতে ফেরে তাদের প্রিয়জনকে, তাদের সোনালী অতীতকে। হয়ত বা মনে মনে আওড়ায় 'Time is this best healer."– একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা যারা তাদের উত্তর পুরুষ পরোক্ষভাবে দেশভাগের বিষময় ফল ভোগ করছি আজও।

ব্রিটিশ পিরিয়ডে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ব্যাপ্তি ছিল বিশাল। এখনকার পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, বাংলাদেশের বগুড়া জেলার অনেকখানি অংশ রাজশাহী ও রংপুর জেলার কিয়দংশ, বিহারের পূর্ণিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের এখনকার উঃ দিনাজপুর ও দঃ দিনাজপুর নিয়ে এই জেলা গঠিত ছিল। ১৭৯৭-৯৮ সালে পূর্ণিয়াকে দিনাজপুর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। কিন্তু এর ব্যাপক অঙ্গচ্ছেদ ঘটে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় ছিল ৩০টি থানা এলাকা। এর এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১০টি থানা এলাকা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্ত হল। নাম হল পশ্চিম দিনাজপুর জেলা। তখন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার জেলা সদর ছিল বালুরঘাট, ১৯৪৮ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের গেজেট নোটিফিকেশন দ্বারা রায়গঞ্জ, নামক আরেকটি নতুন মহকুমা গঠিত হয়। সদর মহকুমা বালুরঘাটের অন্তর্ভুক্ত ছিল বালুরঘাট,গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, তপন এবং হিলি থানা আর রায়গঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভূক্ত হয় রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কুশমণ্ডি, বংশীহারী, কালিয়াগঞ্জ এবং ইটাহার। ১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুযায়ী বিহারের চারটি থানা পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ মহকুমার সঙ্গে যুক্ত হয়। এরা এল চোপড়া, ইসলামপুর, করণদিঘী এবং গোয়ালপোগোর। ১৯৫৯ সালের ২০শে মার্চ এক গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা চোপড়া থানার যে অংশ মহানন্দা নদীর তারে অবস্থিত তা দার্জিলিং জেলার ফাঁসীদেওয়া থানাভুক্ত করা হয়। ফলে মহানন্দা নদী পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উত্তর সীমা রূপে চিহ্নিত হয়। ঐ একই তারিখের আরেকটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা চোপড়া, ইসলামপুর, বারনদিঘী এবং গোয়ালপোখোরকে রায়গঞ্জ মহাকুমা থেকে আলাদা করে ইসলামপুর নামক একটি নতুন মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৯৬৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী গোয়ালপোখোর থানার দক্ষিনাংশ নিয়ে একটি নতুন থানা গঠিত হয়। এর নাম হয় চাকুলিয়া। ফলে ইসলামপুর মহকুমায় থানার সংখ্যা হয় ৫টি। ১৯৪৮ সালের ৮মে বালুরঘাট থানা ভেঙ্গে হিলি থানা এবং সম্ভবতঃ ১৯৮৭ সালে বংশীহারী থানা ভেঙ্গে হরিরামপুর নামক একটি নতুন থানা গঠিত হয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় মোট থানার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭টি, বালুরঘাট জেলা সদর এক প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় নানারকম প্রশাসনিক

অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাই ১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল পশ্চিম দিনাজপুর জেলাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়— উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর। উত্তর দিনাজপুরের সঙ্গে যুক্ত হয় ৯টি থানা—রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, ইটাহার, করণদিঘী, গোয়ালপোখোর, চাকুলিয়া, চোপড়া এবং ইসলামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের সঙ্গে যুক্ত হয় ৮টি থানা—বালুরঘাট, হিলি, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, বংশীহারী, হরিরামপুর এবং কুশমন্ডি। গঙ্গারামপুর নামক একটি নতুন মহকুমা গঠিত হয় এই জেলায়। এর দপ্তর বুনিয়াদপুরে অবস্থিত। এই হল দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রশাসনিক উত্তরনের ইতিহাস। কিন্তু এর বাইরে ও দক্ষিণ দিনাজপুরের রয়েছে এক অতি গৌরবোজ্জ্বল সমৃদ্ধ প্রাচীন-ইতিহাস।

রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং জয়পরাজয়—ইতিহাসের স্বাভাবিক উপাদান হলেও কেবলমাত্র এগুলি নিয়ে কোনো ইতিহাস সঙ্কলিত হতে পারে না। সাধারণ মানুষের কথা তাদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, তাদের জীবনচর্চা, তাদের দুর্ভাগ্য এবং দুষ্কর্ম ও ইতিহাসের অত্যন্ত সজীব উপাদান একজন অনামী ঐতিহাসিক যথার্থই বলেছেন—"History is the study of chaps, Geography is the study of maps." দঃ দিনাজপুর জেলার প্রাচীন ইতিহাসের বিশ্লেষণে সেই সত্যই উঠে আসে।

দঃ দিনাজপুর জেলার ইতিহাস দু'হাজার বছরের চেয়ে ও অনেক অনেক বেশী পুরনো। সম্প্রতি বানগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য সে ইঙ্গিতই দেয়। এই জেলা, রামায়ণ, মহাভারত এবং নানা পৌরানিক কাহিনীতে সঞ্জীবিত। এই কাহিনী এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে। মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন যুগের সভ্যতার আলোকে এই জেলা উদ্ভাসিত। 'রামচরিতের' রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী, শিল্পী বীতপাল এবং ধীমানের কীর্তিধন্য এই জেলা। মুসলিম যুগের বাংলাদেশের প্রথম রাজধানীর উপস্থিতি এই জেলাকে মধ্যযুগের ইতিহাসে করেছে স্মরণীয়। এমন কি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও এই জেলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অবশ্য মধ্য যুগের এবং প্রাচীন কালের প্রশাসনিক ইতিহাসে দিনাজপুর বলে কোন ভূখণ্ডের কথা জানা যায় না। সুলতানী আমলে এ অঞ্চলে গনেশ নামক একজন প্রবল প্রতাপান্বিত হিন্দু সামন্ত রাজা ছিলেন, তাঁর উপাধি ছিল 'পনুজমর্দনদেব'। অনেকে মনে করেন এই উপাধি থেকেই এই ভূখণ্ডের নাম হয়েছে দিনাজপুর। আকবরের আমলে তাঁর রাজস্ব সচিব টোডরমল সমগ্র বঙ্গদেশকে ২৪টি সরকারে বা পরগনায় বিভক্ত করেছিলেন। এই সরকারগুলির মধ্যে অন্ততঃ ৬টি সরকারের অংশবিশেষ নিয়ে ব্রিটিশ যুগে দিনাজপুর জেলা গঠিত হয়েছিল। এই সরকারগুলি ছিল ঘোড়াঘাট, পঞ্জরা, বারবকাবাদ, বাহূজা, জন্নতাবাদ বা লগনৌতি এবং তাজপুর।

সমগ্র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ইতিহাস সমৃদ্ধ স্থান হচ্ছে গঙ্গারামপুরের বানগড়। গঙ্গারামপুর পৌরসভার রাজীবপুর মৌজায় পুনর্ভবা নদীর পূর্ব পাড়ে যে বিশাল ধ্বংসাবশেষ এখনও পরিলক্ষিত হয় তাই বানগড়, ১৯৩৮ থেকে ১৯৪১ সালে পরপর তিন বার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর নেতৃত্বে এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য পরিচালিত হয়েছিল। তাতে পাঁচটি স্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সর্বনিম্নে মৌর্যস্তর, তারপরে শুঙ্গ, তারপরে গুপ্ত, পাল এর সবার উপরে মুসলিম যুগের স্তর। অবশ্য খনন কার্য এখনও চলছে। আরও স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

তবে মৌর্যযুগের বিস্তারিত ইতিহাস জানা যায় না। জৈন কিংবদন্তী এবং পরবর্তীকালে রচিত জৈনগ্রন্থ থেকে ঐ যুগের অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। হরিষেণ রচিত 'বৃহৎ কথাকোষ, নামক জৈন গ্রন্থ থেকে জানা যায় মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন ভদ্রবাহু এবং এই ভদ্রবাহুর জন্মস্থান ছিল এই বানগড় বা তার পার্শ্ববর্তী কোন স্থান, তখন এই স্থানটির নাম ছিল কোটিপুর। এই কোটিপুরের রাজা ছিলেন পদ্মরথ এবং রাণী ছিলেন পদ্মশ্রী, সোমশর্মা নামে এই রাজার এক আশ্রিত ব্রাহ্মণ ছিল। তাঁরই পুত্র হলেন ভদ্রবাহু, তাঁর গুরু ছিলেন দিগম্বর মতে ৪র্থ শ্রুতকেবলী গোবর্ধনাচার্য। কথিত আছে গোবর্ধনাচার্য কয়েকগণ জৈন সন্ন্যাসী এবং পাঁচশত শিষ্যসহ জম্বুস্বামীর সমাধি দর্শনে এই বানগড়ে আসেন। তিনি ভদ্রবাহুর প্রতিভা দর্শনে প্রীত হয়ে তাঁকে জৈনধর্মের দীক্ষিত করেন। গোবধনাচার্যের মৃত্যুর পর ভদ্রবাহু জৈনধর্মের অধিনায়ক পদে বৃত হন। তিনিই ছিলেন পঞ্চম বা শেষ শ্রুত কেবলী। ইনি 'আবশ্যক সূত্র', দশ বৈকালিকসূত্র প্রভৃতি দশখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

জৈনধর্মের প্রথম তীর্থঙ্কর ছিলেন ঋষভ। ২৩তম তীর্থংকর ছিলেন পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ, ২৪ তম বা শেষ তীর্থংকর ছিলেন বর্ধমান মহাবীর, এই তীর্থংকরদের বেশীর ভাগই ছিলেন বর্তমান বিহারের বাসিন্দা। বর্ধমান মহাবীর কৈবল্য অর্থাৎ পরম জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই শিষ্য এবং একজন প্রশিষ্য এই কৈবল্য লাভ করেছিলেন। তাঁর কৈবলী নামে অভিহিত। এরপরে মাত্র ৫জন শ্রুতকেবলী হয়েছিলেন। বর্ধমান মহাবীরের শিষ্য সুধর্মার

শিষ্য জম্বুস্বামী পুণ্ডবর্ধন রাজ্যের কোটিপুরে জৈনধর্ম প্রচারে আসেন এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন।

জৈন কিংবদন্তী অনুসারে মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষ দিকে উত্তর ভারতে ১২ বছর ব্যাপী এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। এতে তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তিনি ভদ্রবাহুর কাছে জৈন ধর্মের দীক্ষা নেন। দুর্ভিক্ষের কারনে ভদ্রবাহু শিষ্য চন্দ্রগুপ্তও ১২ হাজার ভিক্ষুসহ দক্ষিণ ভারতে যান দক্ষিণভারতে বিশেষ করে কর্ণাটকে জৈনধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি শ্রাবনবেলগোলা পাহাড়ে সম্ভবত ২৯৭খ্রীঃপূঃ দেহ রাখেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যও এখানে দেহরক্ষা করেছিলেন।

মৌর্য আমলে পুন্ড্রবর্ধনরাজ্যের রাজধানী ছিল বগুড়ার মহাস্থানগড়ে এই রাজ্যের পূর্বদিকে কোটিপুর নামক একটি নগর ছিল। গুপ্ত আমলে এই স্থানটির নাম ছিল কোটিবর্ষ। উত্তরবঙ্গে গুপ্তযুগের ১০টি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ৪টি রাজশাহী জেলায় এবং ৬টি দিনাজপুর জেলায়, দিনাজপুরের ফুলবাড়ী থানার দামোদরপুরে ৫টি এবং হিলির নিকটবর্তী নবাবগঞ্জ থানার বৈগ্রামে একটি। এই তাম্রলিপিগুলি থেকে তৎকালীন দিনাজপুরের শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিবরণ মোটামুটি জানা যায়।

শাসনতান্ত্রিক দিকে থেকে গুপ্তসাম্রাজ্যের আমলে বঙ্গদেশ কতগুলি ভুক্তি (আধুনিক কালের বিভাগ) তে বিভক্ত ছিল, ভুক্তি আবার কতকগুলি বিষয় (বা জেলা), বীথী ও মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। সর্ব নিম্ন বিভাগ ছিল গ্রাম। অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার পূর্বাংশ নিয়ে ছিল পঞ্চনগরী বিষয়, মধ্যাংশ কোটিবর্ষ বিষয় এবং পশ্চিমাংশ কোন্ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা জানা যায় না। বর্তমান কালের সমগ্র বালুরঘাট মহকুমা ছিল কোটিবর্ষের অন্তর্ভুক্ত।

গুপ্তসম্রাট কুমারগুপ্তের সময়ে প্রদত্ত তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে ভুক্তির শাসনকর্তা ছিলেন উপরিক এবং বিষয়ের শাসনকর্তা কুমার মাতা তাঁর আমলে পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসনকর্তা ছিলেন চিরাতদত্ত এবং কোটিবর্ষের প্রশাসক ছিলেন চিরাতদত্ত কর্তৃক নিযুক্ত বেত্রবর্মন। বুধগুপ্তের আমলে ভুক্তির শাসনকর্তার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় উপরিক মহারাজ এবং বিষয়ের শাসনকর্তা আযুক্তক। এই সময়ে কোটিবর্ষের শাসক ছিলেন শম্ভুক এবং তিনি উপরিক মহারাজ জয়দত্ত কর্তৃক নিযুক্ত ষষ্ঠ শতকের তাম্রলিপিতে (৫৪৩ খ্রীঃ) দেখা যায়, বিষয়ের শাসনকর্তাকে বলা হত 'বিষয়পতি' এই লিপি থেকে জানা যায় কোটি বর্ষের বিষয়পতি ছিলেন স্বয়ম্ভুদেব এ থেকে জানা যায় কোটিবর্ষ বিষয়ের প্রধান শাসন কেন্দ্রের অবস্থান ছিল বর্তমান গঙ্গারামপুরে। এখানকার বিষয়পতিকে পরামর্শ দেবার জন্য চারজন সদস্য বিশিষ্ট একটি সমিতি ছিল। এই চারজন সদস্য হলেন নগর শ্রেষ্ঠি (নগরের প্রধান ব্যাঙ্কার), সার্থবাহ (বনিক সংঘের প্রধান), প্রথম কুলিক (শিল্পীকুল প্রধান) এবং প্রথম কায়স্থ (প্রধান করনিক)। বিষয়ের শাসনকার্য বা অন্ততঃ জমি ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে এই সমিতির সিদ্ধান্ত মেনে চলতেন শাসনবার্তা।

পাল আমলেও কোটিবর্ষ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় কয়েকটি তাম্র এবং প্রস্তর লিপিতে। বানগড়ে প্রাপ্ত রাজা ১ম মহীপাল কর্তৃক প্রদত্ত একটি তাম্রলিপিতে দেখা যায় যে রাজা বিষুব সংক্রান্তি তিথিতে গঙ্গাস্নান করে তার দক্ষিণাস্বরূপ এক ব্রাহ্মণকে কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তর্গত একটি গ্রাম দান করেছেন। তপন থানার মনহলি গ্রামে প্রাপ্ত একটি তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে রাজা মদন পাল তাঁর প্রধান মহিষী চিত্রমতিকা দেবীকে মহাভারত পাঠ করে শুনানোর জন্য দক্ষিণাস্বরূপ কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তর্গত একটি গ্রাম দান করেন। এইভাবে পালযুগের শেষ অবধি অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী অবধি কোটি বর্ষ নামে জেলা রয়েছে। পালরাজারা বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব বাস্তবে ছিল বৌদ্ধধর্মের চেয়েও বেশী। পালরাজাদের আমলে বানগড়ের অদূরেই একটি বৌদ্ধবিহার গড়ে উঠেছিল। এর নাম ছিল দেবকোট বা দেবীকোট। এই দেবীকোট বিহারের আচার্য ছিলেন অদ্বয়বত্র। উধিলিপা, ভিক্ষুনীমোখলা প্রভৃতি এখানে বিদ্যাচর্চা করিতেন। বানগড়ের উত্তরে পুনর্ভবা নদীর পশ্চিমপাড়ে দেবীপুর নামে যে মৌজা এখনও রয়েছে, সেখানেই এই দেবীকোট সম্ভবতঃ অবস্থিত ছিল ।

পালযুগের আরেকটি কীর্তিচিহ্ন মহীপালদীঘি এই জেলার কুশমন্ডি থানায় অবস্থিত। পালরাজা ২য় মহীপাল এই দীঘিটি খনন করেছিলেন। কুশমণ্ডি থেকে অনুমানিক ১০-১২ কি.মি. দূরে আয়রা বনাঞ্চলের সন্নিকটে এই বিশাল দীঘিটি এখনও মজা অবস্থায় বিদ্যমান। ২য় মহীপাল বাংলার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য নাম। একাদশ শতকের শেষ দিকে দ্বিতীয় মহীপাল অত্যাচারী হয়ে উঠলে বরেন্দ্রর জনগণ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কৈবর্ত সম্প্রদায়ভুক্ত দিব্য বা দিব্বোক,—এই বিদ্রোহে দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনচ্যুত এবং নিহত হন। দিব্বোক বরেন্দ্রীর রাজপদে আসীন হন। দিব্বোকের জয়স্তম্ভ বর্তমান বাংলাদেশের পত্নীতলা থানায় এখনও বিদ্যমান। এটি এক সময় অবিভক্ত দিনাজপুরের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই স্তম্ভটি ৪১ ফুট উঁচু এবং ১১ ফুট পরিধি বিশিষ্ট গ্রানাইট পাথরে নির্মিত একটি বৃহৎদীঘির